নবজাতক ৩
স্যালাইন ৪
তরুণ ৬
চিকিৎসা ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৭ সংখ্যা ৩ চৈত্র ১৪০৫

সন্তান প্রসবের পর মায়েদের জন্য যথাযথ জন্মনিরোধক নির্ধারণ

রুখসানা গাজী

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন গবেষণায় সন্তান প্রসবের পর মায়েদের পরিচর্যা ও তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্তান প্রসবের পর মায়ের স্বাস্থ্যগত যেসব বিষয়কে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, যথাযথ জন্মনিরোধক নির্ধারণের বিষয়টি তার অন্যতম। এর কারণ, প্রায়ই দেখা যায়: মা সন্তান প্রসবের পর তার প্রত্যাশিত সময়ের আগেই আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন–যা সন্তান ও মা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঘন ঘন সন্তান ধারণ এবং অধিক সন্তানের জন্মদান মায়ের জীবনের জন্য যেমন হুমকি স্বরূপ, তেমনি দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে বিরতি ২৪ মাসের কম হলে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে: অধিকাংশ মায়েরা মনে করেন, সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়ে আবার মাসিক শুরু না-হওয়া পর্যন্ত গর্ভধারণের ক্ষমতা ফিরে আসে না। তাই যতদিন মাসিক পুনরায় শুরু না হয় ততদিন কোনো প্রকার জন্মনিরোধক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। আবার অনেকে মনে করেন, স্তন্যদানকালীন সময়ে যেকোনো ধরনের জন্মনিরোধক ব্যবহার শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সন্তানকে নিয়মিত বুকের দুধ পান করালে মায়ের শরীরে প্রোল্যাক্টিন নামক হরমোনের মাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকে–যা প্রসব-পরবর্তী মাসিক বিলম্বিত করে। ফলে গর্ভধারণের ঝুঁকিও কমে যায়। অপরদিকে, যেসমস্ত মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান না, তাদের শরীরে প্রসবের পর প্রোল্যাক্টিনের মাত্রা ধীরেধীরে কমতে শুরু করে এবং প্রসবের তিন সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। প্রসব-পরবর্তী মাসিক কত তাড়াতাড়ি শুরু হবে তা নির্ভর করে মায়ের শারীরিক পুষ্টি, বয়স এবং কার্যকরভাবে সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর ওপর। শিশুকে যত তাড়াতাড়ি পরিপূরক খাবার দেওয়া শুরু হবে, তত তাড়াতাড়ি প্রসব-পরবর্তী মাসিক শুরু হবে।

গবেষণায় পাওয়া গেছে: আমাদের গ্রামীণ মহিলারা গড়ে ২৪ থেকে ৩০ মাস পর্যন্ত বা এরও বেশি সময় ধরে শিশুকে বুকের দুধ পান করান। কিন্তু গবেষণায় এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, গ্রামীণ মায়েরা সাধারণত শিশুর বয়স চার মাস পূর্ণ হবার অনেক আগে থেকেই বাড়তি খাবার বা পরিপূরক খাবার দিতে শুরু করেন। এসব কারণে অনেকে মনে করেন, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রসূতি মায়েদেরকে গর্ভধারণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সন্তানকে শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করানোর পরামর্শ দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং প্রসবের পর সহবাস শুরু করার সাথে সাথে (মাসিক শুরু হোক বা না হোক) যথাযথ জন্মনিরোধক ব্যবহারের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। অবশ্য, গ্রামাঞ্চলে মায়েদের কাছে এধরনের পরামর্শ কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, সে-ব্যাপারে মতভেদ আছে। সুতরাং, যে দু'টি বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন, তা হলো: (১) জন্মনিরোধক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রসূতি মায়েদের ব্যবহারোপযোগী কী কী পদ্ধতি আছে এবং (২) কোন পদ্ধতি কখন থেকে শুরু করা উচিত।

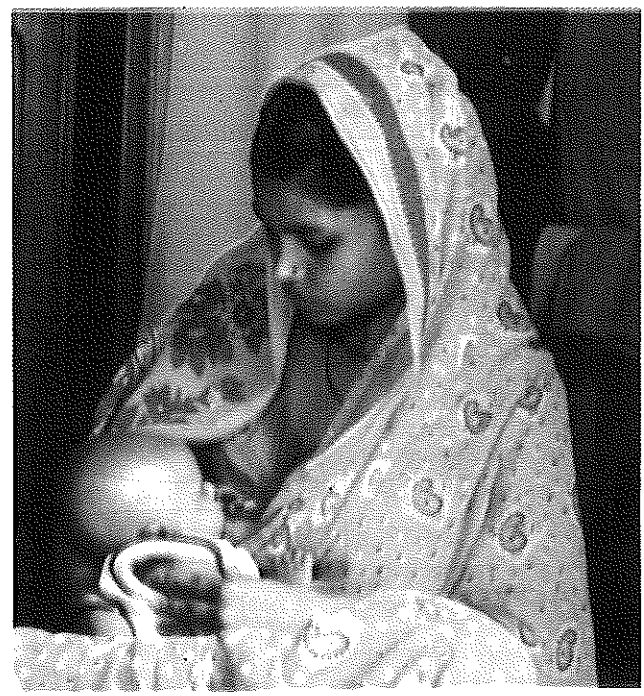

প্রসূতিদের জন্য যথাযথ জন্মনিরোধক নির্ধারণের মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যামিলি হেল্‌থ ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি বিস্তারিত মড্যুল রয়েছে– যার আলোকে বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরা যায় এভাবে :

প্রথমত দম্পতি যদি আর সন্তান না চান, তবে প্রসবের পর পর বা প্রসব-পরবর্তী সময়ে স্থায়ী পদ্ধতি, যেমন পুরুষ ও মহিলা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি, গ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে প্রসূতির জন্য যথাযথ অস্থায়ী জন্মনিরোধক নির্ধারণের জন্য দু'টি বিষয় যাচাই করা খুবই জরুরী: (১) পদ্ধতিটি যেন বুকের দুধের পরিমাণ বা গুণগত মানকে প্রভাবিত না করে এবং (২) মা অথবা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়। এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে পদ্ধতিগুলোকে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে (ক) সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, (খ) মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এবং (গ) কম গ্রহণযোগ্য এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছেন এমন মায়েদের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিসমূহ

- জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক পদ্ধতিসমূহ, যেমন সহবাসের জন্য নিরাপদ কাল বেছে নেওয়া, শিশুকে নিয়মিত ও পরিপূর্ণভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে প্রসব-পরবর্তী মাসিক বিলম্বিতকরণ
- আইইউডি
- কনডম

চিত্র ২ : প্রসব-পরবর্তী জন্মনিরোধ পদ্ধতি

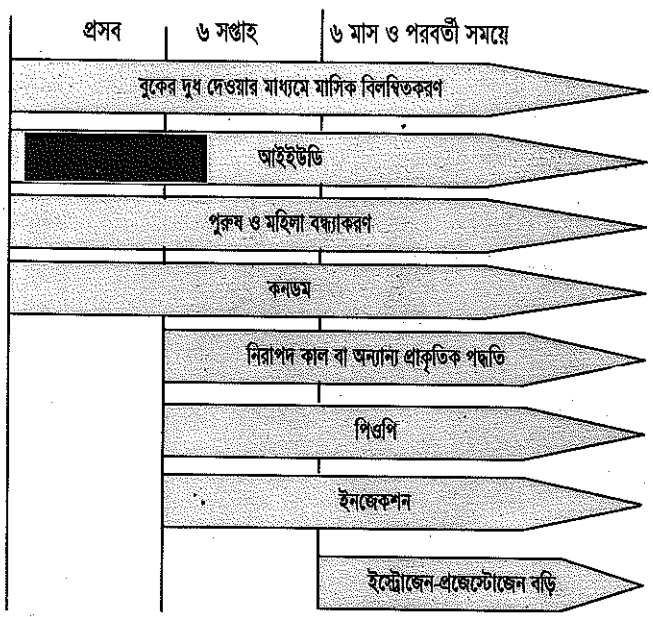

[সূত্রঃ ফ্যামিলি হেল্‌থ ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৪]

খ. বুকের দুধ দানকারী মায়ের জন্য মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিসমূহ

- দুই বা তিন মাস পর পর ইনজেকশন
- নরপ্ল্যান্ট
- শুধুমাত্র প্রজেস্টিন-সম্বলিত খাওয়ার বড়ি (পিওপি)
- স্বল্পমাত্রায় প্রজেস্টোজেন-সম্বলিত খাওয়ার বড়ি

গ. বুকের দুধ দানকারী মায়ের জন্য কম গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিসমূহ

- ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টোজেন-সম্বলিত খাওয়ার বড়ি

প্রসূতি মায়েরা কখন কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা চিত্র-২ এ দেখানো হলো:

শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছেন এমন মায়েরা কখন থেকে জন্মনিরোধক ব্যবহার শুরু করবেন এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রসূতি মা শিশুকে বুকের দুধ দেওয়ার মাধ্যমে প্রসব-পরবর্তী মাসিক বিলম্বিত করতে আগ্রহী হন, তবে তাকে প্রসবের পরপরই শিশুকে নিয়মিত ও কার্যকরভাবে বুকের দুধ দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রসবের চার থেকে আট সপ্তাহ পর অধিক কার্যকর পদ্ধতি, যেমন আইইউডি গ্রহণ করার জন্য মহিলাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রসূতি মা যদি আইইউডি নিতে চান, তবে হয় প্রসবের পরপরই বা প্রসবের চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। প্রসব-পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য কনডম একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি এবং প্রসব-পরবর্তী সহবাস শুরু করার সময় থেকেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র প্রজেস্টিনযুক্ত খাবার বড়ি বা ইনজেকশন প্রসবের ছয় সপ্তাহের আগে শুরু করা উচিত নয়। আবার ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টোজেন-সম্বলিত খাবার বড়ি স্তন্যদানকারী মায়ের ব্যবহার না করাই শ্রেয়, তবে ব্যবহার করতে হলে প্রসবের ছয় মাস পর থেকে শুরু করা উচিত।

শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছেন না এমন প্রসূতি মায়েদের জন্য জন্মনিরোধক

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন না এমন মায়েরা প্রসবের পরপর যে কোনো পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। তবে ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টোজেন-সম্বলিত খাবার বড়ি প্রসবের তৃতীয় সপ্তাহের আগে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

প্রসব-পরবর্তী সময়ে প্রসূতি মায়েদের ব্যবহারোপযোগী পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তাদের আরো বেশি করে জানাতে হবে— যাতে তারা নিজেরা যথাযথ পদ্ধতি বাছাই করতে পারে এবং এ-ব্যাপারে সেবাদানকারীকে কার্যকর পরামর্শ দিতে হবে। সর্বোপরি, এই পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে মায়েদের কাছে আরো সহজলভ্য করে তুলতে হবে।

কম-ওজনের নবজাতক কারণ ও করণীয়

নীহার রঞ্জন সরকার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে কোনো নবজাতকের জন্ম-ওজন ২৫০০ গ্রামের নিচে হলে তাকে নিম্ন জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু বলা হয়ে থাকে। একটি শিশুর স্বাভাবিক জন্ম-ওজন ২৫০০ গ্রাম থেকে ৩০০০ গ্রাম বা তারও বেশি হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি নিম্ন জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। আইসিডিডিআর,বি-পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ থেকে জানা গেছে: বাংলাদেশে শতকরা ৩০ ভাগ শিশুর জন্ম-ওজন ২৫০০ গ্রামের নিচে এবং শিশুদের এই নিম্ন জন্ম-ওজন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

নিম্ন জন্ম-ওজনের কারণসমূহ

ভ্রূণ পরিপূর্ণতা লাভের আগেই যেসব শিশু ভূমিষ্ট হয় তারা যেমন নিম্ন-জন্ম-ওজনবিশিষ্ট হতে পারে, তেমনি পূর্ণ সময় যারা গর্ভে থাকে তারাও নিম্ন জন্ম-ওজন নিয়ে ভূমিষ্ট হতে পারে। মায়ের গর্ভে পরিপূর্ণতা লাভের আগেই অর্থাৎ গর্ভধারণের ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্মগ্রহণ করলে নবজাতক কম-ওজনের হয়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্যসমস্যা এবং ভ্রূণ-সংক্রান্ত জটিলতা নবজাতকের এই কম জন্ম-ওজনের কারণ হতে পারে। নিম্ন জন্ম-ওজনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু মায়ের গর্ভধারণের ৩৭ সপ্তাহ আগেই জন্ম নেয়। গর্ভধারণের ৩৭ থেকে ৪০ সপ্তাহের মধ্যে শিশু ভূমিষ্ট হলে সে মাতৃগর্ভে পরিপূর্ণতা লাভ ক'রে জন্ম নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রসূতির স্বাস্থ্যসমস্যা ও বয়সজনিত জটিলতা

গর্ভবতী মহিলার যেসব স্বাস্থ্যসমস্যার কারণে কম-ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ করে সেগুলো হলো:

১. গর্ভাবস্থায় মায়ের বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা, যেমন: ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, রক্তশুন্যতা (রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১২ গ্রাম-এর নিচে), ইত্যাদি।

২. গর্ভাবস্থার জটিলতা, যেমন: প্রি-এ্যাকলামশিয়া (গর্ভাবস্থায় ২০ সপ্তাহ পর শরীর ফুলে-যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি-পাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ দেখা-দেওয়া এবং প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন নির্গত-হওয়া); গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ, প্লেসেন্টা (ফুল) জরায়ুর নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ না-থেকে অন্যস্থানে আবদ্ধ থাকা (প্লেসেন্টা প্রিভিয়া)।

৩. সাধারণত ২০ বছরে কম ও ৩৫ বছরের বেশি-বয়সী মায়েরা কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু জন্ম দেয়।

ভ্রূণজনিত সমস্যা

নিম্নোক্ত ভ্রূণজনিত সমস্যার কারণেও নিম্ন-ওজনের শিশু জন্ম নেয়:

১. গর্ভে একসাথে একাধিক ভ্রূণ জন্ম নিলে

২. ভ্রূণের ত্রুটিপূর্ণ গঠনের কারণে

৩. মায়ের রক্তের Rh-গ্রুপের সাথে ভ্রূণের রক্তের Rh-গ্রুপের অমিল হলে

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ

নিম্ন জন্ম-ওজনের অনেকগুলো কারণের অন্যতম হলো দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও মায়েদের পুষ্টিহীনতা। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মা আমাদের দেশে অপুষ্টিতে ভুগছে। তাছাড়া কিছু সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসও নিম্ন জন্ম-ওজনের শিশু জন্ম নেওয়ার একটি প্রধান কারণ। আমাদের দেশে অঞ্চলভেদে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় খাবার কম পরিমাণে খেতে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস, গর্ভাবস্থায় কম খেলে সন্তান-প্রসবের সময় মা কষ্ট কম পাবে। আবার কিছু কিছু খাবার, মূলত যা গর্ভবতী মা ও গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি যোগায়, তা খেতেও নিষেধ করা হয়।

নিম্ন জন্ম-ওজনের সমস্যাসমূহ

এক বৎসর বয়সের শিশুদের মৃত্যুহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়: নিম্ন জন্ম-ওজনের শিশুদের মৃত্যুহার স্বাভাবিক জন্ম-ওজনের শিশুদের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি। তাৎক্ষণিক মৃত্যু ছাড়াও নিম্ন জন্ম-ওজনের শিশুরা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। যেমন:

১. জন্ম-পরবর্তী দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। ওজন ও উচ্চতা আশানুরূপ হয় না।

২. প্রায়শ ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও হামসহ বিভিন্ন প্রকারের জীবনঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

৩. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে: নিম্ন জন্ম-ওজনের শিশুদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে কম।

৪. সাম্প্রতিক এক গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে: নিম্ন জন্ম-ওজনের শিশুরা বয়স্ক হলে করোনারি হার্ট ডিজিজ অর্থাৎ হৃদরোগে ভোগে।

নবজাতকের নিম্ন জন্ম-ওজন প্রতিরোধের জন্য করণীয়

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলাদেশে অবকাঠামোগতভাবেই নারীরা অবহেলিত। বর্তমানেও নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এ-কথা বলা যাবে না। এখনও এরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এমনকি পারিবারিক পর্যায়েও নিস্পেষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত আমাদের গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি পরিবারের কর্তব্যক্তিরা উদাসীন। নারীরাই পরিবারের সবাইকে খাবার

(৭-এর পাতায় দেখুন)

পূর্বে রান্না-করা চালের তৈরি খাবার স্যালাইনের স্থায়িত্বকাল নির্ণয়

সুফিয়া ইসলাম

প্রতিবছর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের ঢাকা ও মতলব হাসপাতালে হাতে-তৈরি খাবার স্যালাইন (লোকে যাকে চিনির স্যালাইন বলে) ডায়রিয়া ও আমাশয়-আক্রান্ত রোগীদের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ঢাকার কলেরা হাসপাতালে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়। প্রায় ২০ বছর আগে হাতে-তৈরি সুক্রোজ-খাবার স্যালাইন নির্ধারিত মান অনুযায়ী ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। এই হাসপাতালের কর্মচারীদের সমবায় সমিতিতে হাতে-তৈরি চালের স্যালাইনের উৎপাদন শুরু হয়েছে। গত নয় বছরে প্রায় ছয় লক্ষ রোগীকে এই স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই হাসপাতালে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। হাসপাতালের রোগীদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বাসায় ব্যবহারের জন্য এই স্যালাইনের প্যাকেট রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, এই স্যালাইন ব্যবহারের আগে রান্না করে নিতে হয়। উপরন্ত, এই খাবার স্যালাইন গরমকালে ৬ ঘণ্টার বেশি রেখে দেওয়া যায় না। এই সমস্যার আলোকে পূর্বে রান্না-করা চালের তৈরি একধরনের খাবার স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে—যা ডায়রিয়া রোগীদের জন্য উপকারী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই নতুন খাবার স্যালাইনের প্যাকেটগুলো ঢাকার কলেরা হাসপাতালে তৈরি ও ব্যবহার করা হয়। রোগীদের কাছে এই স্যালাইন ইতোমধ্যে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

এই রান্না-করা খাবার স্যালাইন খুব সহজেই তৈরি করা যায় এবং এটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহের জন্যও উপযোগী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, রান্না-করা খাবার স্যালাইনের প্যাকেটের স্থায়িত্বকাল মাত্র তিন মাস।

উপকরণ ও প্রণালী

এই নতুন রান্না-করা চালের গুঁড়োর স্যালাইন সিদ্ধ চাল থেকে তৈরি করা হয়। প্রথমে চাল পানিতে ধুয়ে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। তারপর এই রান্না-করা চাল ধাতুর তৈরি ট্রে-এর উপর ছড়িয়ে দিতে হয়। একটি ওভেনে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা ১০০°সে. তাপমাত্রায় শুকাতে হয়। শুকানোর পর চাল-ভাঙানোর মেশিনে গুঁড়ো করে চালনী দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিতে হয়। আধা লিটার পরিমাণ স্যালাইনের জন্য ২৫ গ্রাম চালের গুঁড়োর সঙ্গে ১.৭৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড, ০.৭৫ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং ১.৮৫ গ্রাম সোডিয়াম সাইট্রেট মিশাতে হয়। ২০০ প্যাকেট স্যালাইন তৈরির জন্য পরিমাণমত চালের গুঁড়ো ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মেপে নিয়ে একটি বড় পাত্রে একসঙ্গে হাত দিয়ে ভালো করে মেশাতে হয়। ন্যূনতম আর্দ্রতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মেশানো খাবার স্যালাইন দ্বিতীয়বারের মত ওভেনে ১০০°সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা শুকাতে হয়।

তারপর মিশ্রণ থেক ২৯.৩৫ গ্রাম করে মেপে একেকটি প্যাকেট তৈরি করা হয়—যা আধা লিটার পানিতে গুলে খেতে হয়। প্রতি ৩০ প্যাকেটের মধ্য থেকে দুই বা তিনটি প্যাকেট নিয়ে খাবার স্যালাইনের ভৌত ধর্ম, যেমন: রং, গন্ধ, আর্দ্রতার পরিমাণ এবং কতটা ঝুরঝুরা তা পরীক্ষা করা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে এই স্যালাইনে আয়নের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

এক গবেষণায় পূর্বে রান্না-করা এই নতুন খাবার স্যালাইনের ১৮০টি প্যাকেটের স্থায়িত্বকাল পরীক্ষা করা হয়। ৯০টি প্যাকেট রাখা হয় ১টি পলিথিন ব্যাগে এবং অন্য ৯০টি রাখার জন্য ২টি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকেটগুলো বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের পরিবারে ৩ মাসের জন্য রাখা হয়। এই পরীক্ষার জন্য ৩০টি পরিবারকে অনির্দিষ্টভাবে বেছে নেওয়া হয়। প্রতিটি পরিবারকে ৬টি করে প্যাকেট (৩টি এক পলিথিনে-মোড়া এবং ৩টি দুই পলিথিনে-মোড়া) শোবার ঘরে রাখার জন্য দেওয়া হয়। প্যাকেটগুলো বিতরণের সময় মাঠ-কর্মীরা এসব প্যাকেটের সংরক্ষণ-সম্পর্কিত তথ্য লিখে রাখে। অর্থাৎ পরিবারটি কোন পাত্রে এবং কোন স্থানে প্যাকেটগুলি রেখেছে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। মাঠ-কর্মীরা প্রথম মাসে প্রতিসপ্তাহে একবার এবং পরবর্তী দুই মাসে প্রতি পনের দিন অন্তর মোট চারবার প্রতিটি পরিবার পরিদর্শন করে। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে মাঠ-কর্মীরা স্যালাইন-রাখা পাত্রের পরিবর্তন এবং স্থান লিখে রাখে। প্রত্যেক মাসের শেষে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য মাঠ-কর্মীরা একটি এক পলিথিনে-মোড়া ও আরেকটি দুই পলিথিনে-মোড়া প্যাকেট প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

ঢাকার কলেরা হাসপাতালে একটি অসুস্থ শিশুকে তার মা চালের তৈরি খাবার স্যালাইন খাওয়াচ্ছে

গবেষণাগারের কর্মকর্তারা স্যালাইনের প্যাকেটের গন্ধের কোনো পরিবর্তন হলো কি না তা পরীক্ষা করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা এর দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনও পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন সময়ে মিশ্রণটি কতটা ঝুরঝুরা থাকে তা এবং এর আর্দ্রতার পরিমাপ গবেষণাগারের নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। উভয় ধরনের প্যাকেটের খাবার স্যালাইনগুলো অনির্দিষ্টভাবে বেছে নিয়ে এর আয়নের পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়। আর্দ্রতার পরিমাণ পরীক্ষার জন্য স্যালাইন ওভেনে ১০৫°সে. তাপমাত্রায় রেখে প্রতি এক ঘন্টা পর পর এর ওজন নেওয়া হয়। এটা চলতে থাকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ওজনে না পৌছানো পর্যন্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ওজনের বিয়োগফল থেকে শতকরা আর্দ্রতার পরিমাণ করা হয়। এই গবেষণার কাজ শীতের শেষ থেকে শুরু করে বর্ষার শুরু পর্যন্ত চলে।

ফলাফল এবং আলোচনা

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত ৩০টি পরিবারের মধ্যে ১০টি পরিবার স্যালাইনের প্যাকেটগুলো কোনো পাত্রের ভিতরে রাখে নি। তারা শেলফ বা আলমারীর ভিতরে বা উপরে প্যাকেটগুলো রাখে। দুইটি পরিবার এই প্যাকেট রাখার স্থান পরিবর্তন করে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে: প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে স্যালাইনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় নি, যদিও প্রথম মাসে দু'টি প্যাকেট তেলাপোকা বা অন্য পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তৃতীয় মাসে দু'টি প্যাকেটের ভিতর কালো ময়লা দেখা দেয়।

তৃতীয় মাসে, শুধুমাত্র গন্ধের কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণ করে দেখা যায় যে, মিশ্রণের অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ঠিক আছে।

বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী সময়ের চাইতে পরবর্তী সময়ে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে–অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে স্যালাইনের প্যাকেটের আর্দ্রতা ক্রমে বাড়তে থাকে। তৃতীয় মাসের শেষে আর্দ্রতার পরিমাণ দুই পলিথিনে-মোড়া প্যাকেটে এক পলিথিনে-মোড়া প্যাকেটের চাইতে কম থাকে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, পূর্বে রান্না-করা হাতে-তৈরি খাবার স্যালাইন কুটিরশিল্পে প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই স্যালাইনের সুবিধা এই যে, ব্যবহারের আগে পানি মিশিয়ে এটি তৈরি করা যায়। এই স্যালাইন তৈরির জন্যে রান্নার কোনো প্রয়োজন হয় না। এই নতুন স্যালাইনের মূল্য বেশি, তবুও বানানোর সুবিধার জন্য এটি খুবই গ্রহণযোগ্য।

এই গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে রান্না-করা খাবার স্যালাইনের স্থায়িত্বকাল মাত্র তিন মাস। একটি কিংবা দু'টি পলিথিনে-মোড়া প্যাকেটে এটি তিন মাসের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে স্যালাইনের প্যাকেটের তিন মাস স্থায়িত্বকাল খুবই নগণ্য। এর স্থায়িত্বকাল বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। কম ছিদ্রবিশিষ্ট উন্নতমানের মোড়ক ব্যবহারের মাধ্যমে এই স্যালাইনের স্থায়িত্বকাল বাড়ানো সম্ভব।

অষ্টম বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং তারিখে আইসিডিডিআর,বি-তে অনুষ্ঠিত হলো এ-কেন্দ্রের অষ্টম বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। কেন্দ্রের সাসাকাওয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈজ্ঞানিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কেন্দ্রের অন্তবর্তীকালীন পরিচালক অধ্যাপক জর্জ ফুশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব সালাহ্উদ্দীন ইউসুফ বিশেষ অতিথি ছিলেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক ডক্টর আব্দুল্লাহ হেল বাকী অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো (১) টীকা-সংক্রান্ত গবেষণা (Vaccine Research) এবং (২) পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা (Environmental Health)। মোট ১০টি বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে ৫৭টি নিবন্ধ পরিবেশন করেন কেন্দ্রের ও দেশী-বিদেশী অন্যান্য সংস্থার বিজ্ঞানীগণ। ১৮টি নিবন্ধ পোস্টার আকারে উপস্থাপিত হয়।

টীকা-সংক্রান্ত গবেষণা (Vaccine Research) বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর ড. জর্জ কলিন। বিজ্ঞানীগণ ১৭টি নিবন্ধের মাধ্যমে টীকা-সংক্রান্ত গবেষণার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন এবং এ-ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অবস্থা তুলে ধরেন। বক্তারা আমাদের দেশের জনসাধারণের জন্য সম্প্রসারিত টীকা কার্যক্রমের মাধ্যমে হেপাটাইটিস, টাইফয়েড এবং রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়ার টীকা দানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা-সংক্রান্ত অধিবেশনের মূল বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্ হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ড. ব্রাডলী স্যাক। পানি ও পয়:নিষ্কাশন বিষয়ক গবেষণার, বিশেষ করে পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণার প্রতিফলন ঘটে ১৩টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে। পরিবেশের অন্য যেসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হচ্ছে: শব্দদূষণ, শ্রবণ-শক্তি হ্রাস, সীসা ও ক্যাডমিয়ামদূষণ, হাসপাতাল ও ক্লিনিক বর্জ্য, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ইত্যাদি। পানিতে আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যার প্রতিকারের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যা ও তার সমাধানের লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে গবেষণা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত পেশ করেন। এসব তথ্য ও গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

ডায়রিয়ার চিকিৎসা

(৮-এর পাতার পর)

পুষ্টিকর খাবার

৬ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশুকে বুকের দুধ ঘন ঘন খাওয়াতে হবে। কোনো কারণবশত: শিশু অন্য দুধে অভ্যস্ত থাকলে সেই দুধই কাপ/গ্লাস ও চামচের সাহয্যে ৩ ঘণ্টা পর পর খাওয়াতে হবে।

৬ মাসের বেশি বয়সের বা প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের জন্য বয়স অনুপাতে টাটকা ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াবেন। শিশুদের ৩/৪ ঘণ্টা পর পর খাওয়াবেন, কারণ তারা একবারে বেশি পরিমাণে খেতে পারে না। ভাত, ডাল, শাকসব্জি, ডিম, মাছ, মাংশ, খিঁচুড়ি ইত্যাদি খাবার দিতে পারেন। তবে ১/২ চামচ তেল মিশিয়ে নরম করে শিশুর খাবার রান্না করবেন। মওসুম অনুযায়ী টাটকা ফল খাওয়াবেন, পাকা কলা চট্‌কিয়ে খাওয়ালে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ডায়রিয়া সেরে গেলেও অন্তত ২ সপ্তাহ শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একবার অতিরিক্ত খাবার খাওয়ান। এতে শিশু তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে ও স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পাবে।

ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ

বাড়িতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে নিচের লক্ষণগুলোর যেকোনো একটি বা একাধিক দেখা দিলে সাথেসাথে রোগীকে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে নিয়ে যান, কারণ এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ এবং সময়মত চিকিৎসা না করলে বিভিন্ন জটিলতা, এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

- দীর্ঘসময় ধরে ঘনঘন পাতলা পায়খানা
- খুব বেশি তৃষ্ণার্ত
- খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে অনিচ্ছা
- মলের সাথে রক্ত
- প্রস্রাবের পরিমাণ কম-হওয়া/বন্ধ হয়ে-যাওয়া
- বারবার বমি
- চোখ বসে-যাওয়া
- জ্বর
- ৩ দিনের মধ্যে রোগীর অবস্থার কোনো উন্নত না হওয়া
- ডায়রিয়া ১৪ দিনের বেশি স্থায়ী হওয়া

বাড়িতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা খুবই সহজ। একটু সচেতন হলেই আমরা ডায়রিয়ার জটিলতা এড়াতে পারি; এড়াতে পারি কত অহেতুক মৃত্যু; বেঁচে যায় কত মূল্যবান জীবন আর পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

বিশ্ব এইডস প্রচারণায় তরুণ সম্প্রদায়

পরিবর্তনের শক্তি

লাজিনা মুনা

পহেলা ডিসেম্বর বিশ্ব এইড্‌স দিবস। ১৯৯৮ সনে এই দিবসের ডাক ছিলো তরুণদের প্রতি। সচেতনতা সৃষ্টিতে ১০-২৪ বছর বয়স্ক কিশোর-তরুণদের প্রতি এ-আহ্বানের কারণ খতিয়ে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। সারা বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে ৭০০০ তরুণ HIV দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিমিনিটে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচজন। সর্বত্র যখন এইডস-এর ভয়াল থাবা বিস্তারিত হচ্ছে, বাংলাদেশে এইডস-সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস কতটা জোরালো তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

১৯৯৫ সাল থেকে সরকারি প্রচারণা ও নানা পদক্ষেপ এইডস মোকাবেলার ক্ষেত্রে নীতিগত সহায়তা দিয়ে চলছে। ফলে আমরা এখন জানি এইডস কী, কিভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিকার কী? কিন্তু এসব কাগুজে প্রস্তাবনায় এইডস প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে লক্ষ্য যখন তরুণেরা।

এইডস-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবায় তরুণদের অন্তর্ভূক্ত করতে হলে কিছু সত্যের সাহসী উচ্চারণ প্রয়োজন। যে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের তরুণদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, তা হচ্ছে বিয়ের আগে এ-দেশের তরুণদের যৌন অভিজ্ঞতা হয় না। অভিভাবকদের এই অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিনয়ের সাথে দুঃখ প্রকাশ করে এবং তরুণদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে হয়, তারুণ্যের উচ্ছলতায় অপরিণত আবেগে যুগপৎ শহর ও গ্রামাঞ্চলে 'এ অভিজ্ঞতা' কমবেশি সব তরুণেরই হয়ে থাকে। এ-সত্যের উপলব্ধি কেবল সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণের ফল নয়, এ হলো গবেষণালব্ধ তথ্য। সত্তরের দশকে পরিচালিত আইসিডিডিআরবি'র গবেষণা থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীমুখী এ-দশকে Save the Children, Population Council-এর জরিপে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণারত—নিজেদেরকে সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একাংশ মনে করি, বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনায় প্রদীপ্ত বলে অহংকারে মেতে উঠি—তাদের অনেকেরও এই সাহসী উচ্চারণের মানসিকতা নেই। এইডসকে আমরা ডায়রিয়া অথবা ম্যালেরিয়ার মত না দেখে একে 'খারাপ অসুখ' হিসেবে চিহ্নিত করি। এইডস-এর সাথে যৌনকাজের একটা যোগ থাকায় খুব সযত্নে একে পরিহার করি, কনডম ব্যবহারের প্রসঙ্গ এলে লজ্জায় চোখ নামাই। বিজ্ঞানমনস্ক, স্বাস্থ্যসচেত জনগোষ্ঠীর এহেন আচরণ কেবল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না, বরং রীতিমতো আশংকার জন্ম দেয়। উটপাখির মত বালিতে মুখ

গুঁজে আমরা ভাবছি 'এইডস বিদেশীদের রোগ'। অথবা বলছি: মুসলমানদের এ-রোগ হয় না। কিন্তু এরকম সকল ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মুসলমান-অধ্যুষিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা কি এখনও খুব বেশি দূরে? আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও বার্মায় এর ছোঁয়া লেগেছে।

তরুণদের উদ্দেশে প্রচারণা বা স্বাস্থ্যসেবা যা-ই চাই না কেন, সবচেয়ে আগে চাই তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। তাদের আবেগ, মুল্যবোধ, জ্ঞান এবং আচরণের প্রকৃতি না বুঝলে কোনো স্বাস্থ্য-তথ্য ও সেবা কোনোকিছুই তাদের কাছে পৌছানো যাবে না। প্রথমেই প্রয়োজন সঠিক তথ্যের। যৌনকাজ সহজাতপ্রবৃত্তি সঞ্জাত, এই ধারণায় তরুণদের বিশ্বাসভাজন হয়ে জানতে হবে তাদের প্রয়োজন। বদ্ধ সংস্কারের কবল থেকে বেরিয়ে এসে সত্য উচ্চারণের সাহস নিয়ে ভিন্ন মাত্রার পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কোনো একদিন উগাণ্ডার মত আমরাও হয়তো উজাড় হয়ে যাবো এইডস-এর আক্রমণে।

কম-ওজনের নবজাতক

(৩-এর পাতার পর)

পরিবেশন করে। অথচ সবার খাওয়ার শেষে যা অবশিষ্ট থাকে তা খেয়েই ওরা সন্তুষ্ট থাকে। সুস্থ শিশুর জন্য চাই সুস্থ মা। তাই আমাদের নারীদের পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

নবজাতকের নিম্ন জন্ম-ওজন প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে:

- ২০ বছর বয়সের পর মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে এবং ৩৫ বছর বয়সের আগেই সন্তান নিতে হবে।
- গর্ভধারণের আগে চিকিৎসকের দ্বারা নারীর শারীরিক উপযুক্ততা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।
- গর্ভধারণের পর নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে এবং প্রচুর পানি পান করতে হবে।
- ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্য সময়ের চেয়ে গর্ভাবস্থায় ২/৩ ঘণ্টা অতিরিক্ত বিশ্রাম নিতে হবে।

স্বাস্থ্য কুইজ ২৪

১. গর্ভকালীন সময়ে মায়ের নূন্যতম কত কেজি ওজন বৃদ্ধি প্রয়োজন?

২. যক্ষার প্রধান লক্ষণ কী? প্রধান লক্ষণ ছাড়া অন্যান্য লক্ষণ তিনটি কী কী?

৩. জন্মের পর থেকে কত বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মস্তিষ্কের (brain) বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়?

৪. কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ তিনটি কী কী?

৫. আমাশয় রোগের চিকিৎসায় কোন ৪টি মূল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ?

(প্রশ্নগুলোর উত্তর ৫ আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখে মধ্যে পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ ২৩-এর উত্তর

১. ২০ বছর বয়সের আগে এবং ৩৫ বছর বয়সের পরে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়।

২. যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কখনো কখনো নিবিড় যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে যেসমস্ত রোগ সংক্রামিত হতে পারে সেগুলোকে ডাক্তারী ভাষায় যৌনরোগ বলে।

বাংলাদেশে সচরাচর সংক্রমণকারী দুটি যৌনরোগ– গণোরিয়া ও সিফিলিস।

৩. যৌনমিলন ছাড়াও মহিলাদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে:

ক. জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি অনুসরণ না করে আই.ইউ.ডি প্রয়োগ অথবা প্রয়োগের পর অপরিষ্কার হাতে সূতা পরীক্ষা করা

খ. সন্তান প্রসবের সময় অপরিষ্কার/অপরিচ্ছন্ন থাকা

গ. মাসিকের সময় অপরিষ্কার প্যাড/কাপড় ব্যবহার

৪. ১৫ বছর শুরু হতেই মহিলাদের প্রথম ডোজ টিটি টিকা নিতে হয়। মোট ৫ ডোজ টিটি টিকা নিতে হয় এবং এর সময়সূচী নিম্নরূপ:

টিকার ডোজ	কখন নিতে হবে
টিটি ১	১৫ বছর বয়স শুরু হতেই
টিটি ২	টিটি ১ নেবার ১ মাস পর
টিটি ৩	টিটি ২ নেবার ৬ মাস পর
টিটি ৪	টিটি ৩ নেবার ১ বছর পর
টিটি ৫	টিটি ৪ নেবার ১ বছর পর

৫. শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোকালীন সময়ে সাধারণত ৪টি কারণে আবার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেগুলো হচ্ছে; (ক) একবার বুকের দুধ খাওয়ানোর পরে পরবর্তীবার বুকের দুধ খাওয়ানোর মাঝে প্রায়ই ৬ ঘন্টার বেশি ব্যবধান হলে; (খ) শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে; (গ) প্রসবের পরে এবং পুনরায় মাসিক শুরু হলে; (ঘ) শিশু যদি মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার ও পানীয় গ্রহণ করে।

(সবগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

জেনে রাখা ভালো

বাড়িতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা

পাতলা বা নরম পায়খানা যেকোনো বয়সের মানুষের যেকোনো সময়ে হতে পারে। এধরনের পায়খানা যদি দিনে (২৪ ঘণ্টায়) ৩ বারের বেশি হয় তাহলেই তাকে বলা হয় ডায়রিয়া। পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ায় বেশি ভোগে পাঁচ বছরের কম-বয়সের শিশুরা। সময়মত সুচিকিৎসা না পেলে দেখা দেয় বিভিন্ন জটিলতা, এমনকি রোগী মারাও যেতে পারে। অথচ ডায়রিয়া রোগীর পরিচর্যা ও সুচিকিৎসা ৯০% রোগীর বেলায় নিজের বাড়িতেই সম্ভব।

আপনারা ইতিমধ্যেই শুনে থাকবেন যে, পাতলা পায়খানা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই রোগীকে প্রচুর তরল খাবার দিতে হবে। অবশ্য খাবার স্যালাইনও বানিয়ে খাওয়াতে হবে, প্যাকেট স্যালাইন না থাকলে লবণ-গুড় অথবা চালের গুঁড়ার স্যালাইন বানিয়ে খাওয়াতে হবে। দেখা গেছে, যেসব রোগীকে ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাড়িতে সময়মত স্যালাইন ও প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খাওয়ানো হয় তারা অল্প দিনেই ভালো হয়ে যায় এবং তাদের জটিলতাও দেখা দেয় না। আমরা যদি ডায়রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রত্যেকটি বাড়ির মাকে সঠিকভাবে বোঝাতে পারি তা'হলে শতকরা নব্বই ভাগ রোগীই হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে না গিয়েই ভালো হয়ে উঠবে।

বাড়িতে কী ধরনের ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা করা যায়

১. যেকোনো মানুষের ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথেসাথেই বাড়িতে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

২. হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডায়রিয়া রোগীর মারাত্মক পর্যায়ের চিকিৎসার পর বাড়িতে ফেরার পরেও পাতলা/নরম পায়খানা ঘন ঘন হলে বাড়িতেই চিকিৎসা সম্ভব।

বাড়িতে ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য তিনটি নিয়ম জানা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন :

১. পাতলা পায়খানা শুরুর সাথে সাথেই স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার দিন; তাহলে পানিস্বল্পতা দেখা দেবে না এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর উপর চাপ কমবে।

২. ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে স্বাভাবিক এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। এতে পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধ করা যায়।

৩. মারাত্মক বা ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারলে সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। ফলে জটিলতা/মৃত্যু এড়ানো যায়।

স্যালাইন ও তরল খাবার

প্যাকেট স্যালাইন থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে রোগীকে পরিমাণমত খাওয়াতে শুরু করুন। প্যাকেট স্যালাইন না থাকলে বাড়িতেই লবণ-গুড় অথবা চালের গুঁড়ার স্যালাইন বানিয়ে রোগীকে খাওয়ান। অন্যান্য তরল খাবার, যেমন ভাতের মাড়, চিড়ার চট্‌কানো পানি, ডাবের পানি,

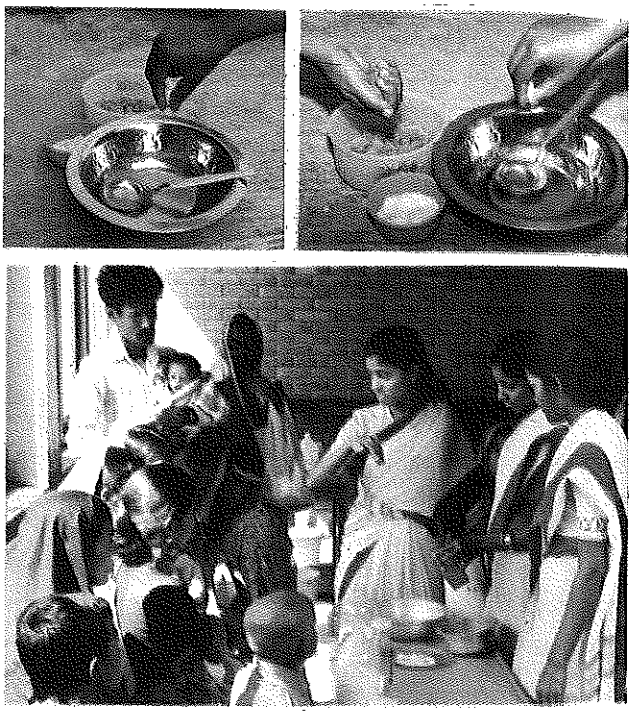

উপরের দু'টি ছবিতে লবণ-গুড় স্যালাইন তৈরির সরঞ্জাম এবং নিচের ছবিতে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে লবণ-গুড় স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে

স্যুপ, ফেটানো দই/লাচ্ছি, দুধ ও চিনি ছাড়া হালকা চা বা পানি খাওয়ালে রোগীর পানিস্বল্পতা দেখা দেয় না। ডায়রিয়া হলেও শিশুকে সবসময় বুকের দুধ খাওয়াতে হবে কোনো অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা উচিত নয়।

(৬-এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক জর্জ ফুশ; **সম্পাদক ঃ** ডা: ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শাসসুল ইসলাম খান

সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, ডা: মহসীন আহমেদ, ডা: হাসান আশরাফ, ড: দিলারা ইসলাম ও এম.এ.রহীম; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী;

প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬ টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বিজে.; ই-মেইল : msik@icddrb.org

মুদ্রণে ঃ সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী রেলগেট, ঢাকা